যতটা চেয়েছি পেয়েছি তার শতগুণ

সুভাষ দত্ত

জন্ম আমার মামাবাড়ি দিনাজপুরের মুন্সীপাড়ায়। ১৯৩০ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি রোববার, বাংলা ১৩৩৬ সালের ২৬ মাঘ রাত ৯টায়। বাবা প্রভাষ চন্দ্র দত্ত এবং মা প্রফুল্ল নন্দিনী দত্তের প্রথম সন্তান আমি। বাবার নামের সঙ্গে মিলিয়ে নাম রাখা হলো সুভাষ দত্ত। জন্ম, বড় হওয়া, লেখাপড়া সবকিছু মামাবাড়ি দিনাজপুরে হলেও আমাদের আদি বাড়ি বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দিতে। যমুনা নদীর পাড়েই কেটেছে একেবারে শিশুকাল।

দিনগুলি মোর....

যমুনার পাড়ে যখন বড় হয়ে উঠছিলাম ধীরে ধীরে, আমার দুরন্তপনাই আমার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দিল। যতটুকু জেনেছি, আমার প্রপিতামহ, পিতামহ ছিলেন বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি থানার মোশারপাড়া গ্রামের জমিদার। ছোটবেলায় জমিদার বাড়ির আস্তাবলে আমি হাতি, ঘোড়া দেখেছি। ঠাকুরদাকে দেখেছি ঘোড়ায় চড়ে বাড়ি আসতে। অগাধ সম্পত্তি, কাজের খুব দরকার ছিল না বলেই হয়তো বাবা তখনকার দিনে বিএ পাস হওয়া সত্ত্বেও তেমন কোনো কাজকর্ম করতেন না। বাবা-কাকারা গানবাজনা, নাটক, থিয়েটার নিয়েই সময় কাটাতেন। মায়ের ধারণা ছিল এখানে থাকলে দুষ্টুমি করেই আমার দিন কাটবে, পড়ালেখা আর হবে না। তাই আমার বয়স যখন চার, মামাবাড়ি বেড়াতে গেলাম মায়ের সঙ্গে। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম পাশে মা নেই। খবর নিয়ে জানলাম মা আমাকে মামাবাড়ি রেখে গেছেন। এখন থেকে আমি এখানেই থাকবো। অভিমান আর ভয় দুটোই আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। প্রচন্ড কান্নায় প্রতিবাদ জানালাম। দাদু-দিদিমা, মামা-মামী, মাসীরা অনেক আদরে বোঝালো দেশের বাড়িতে আমার লেখাপড়া হবে না। তাই এখানে থেকে আমি পড়ালেখা করবো। কিন্তু শিশু মনে মায়ের সেই ফাঁকি দিয়ে চলে যাওয়ার কষ্ট চোখের জলের সঙ্গে অঝোরধারায় বইতে থাকলো। বড় হয়ে উপলব্ধি করেছি সেইদিন মা যদি আমাকে রেখে না আসতেন মামাবাড়িতে, আজ হয়তো জীবনটা এভাবে গড়ে উঠতো না। শহরের পরিবেশে বড় হয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য এমন কঠিন সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন।

শুরুতেই শেষ

মামাবাড়ির সবার আদরে এক সময় কষ্ট আর অভিমান ভুলে পাঠাশালায় যাবার জন্য তৈরি হলাম। ছোট মামা ছিলেন আমারই বয়সী। তখনকার সময় দিনাজপুরের নামকরা গণেশতলা পাঠশালায় ভর্তি করা হলো আমাকে। ছোট মামার সঙ্গে বেশ পরিপাটি হয়ে পাঠশালায় গেলাম। এখানে একটি গোপন কথা বলে রাখি। আমার পোশাকি নামটির আড়ালে আরো ছোট্ট খানিকটা বিব্রতকর একটি নাম আছে। যে নামটা কাছের মানুষরা ব্যবহার করতেন। আর তা হচ্ছে 'পটল'। যা হোক, পাঠশালার প্রথম দিনে ছোট মামার পেছনের বেঞ্চিতে আমি বসেছি। আমার পেছনে অন্য ছাত্ররা। তখন পাঠশালার বেঞ্চিতে কালির দোয়াত রাখা হতো। আমার পেছনের ছেলেটা বারবার বলতে থাকলো 'পটলা, পটলা, পটলভাজা খাব'। ক্রমাগত এই সুর ভেজে যাওয়ায় ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠছিলাম। এক পর্যায়ে কালির দোয়াত ছুঁড়ে মারলাম ছেলেটির দিকে। আঘাত করলো চোখে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগলো। অবস্থা বেগতিক দেখে ঝেড়ে দৌড়, এক দৌড়ে মামাবাড়ি। পরিণতি পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ। পড়ালেখার প্রথম পদক্ষেপে আমি ব্যাক টু দি প্যাভিলিয়ন।

আমি সেই ছেলে

আমি তখন অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। 'সুতরাং' ছবিটিও মুক্তি পেয়ে গেছে। বলা যায় যথেষ্ট পরিচিত। ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কিছুদিন পর দিনাজপুর গেছি। স্টেশনে নেমে একটি রিকশা নিয়ে মামাবাড়ি গেলাম। ভাড়া মিটিয়ে চলে যাওয়ার সময় রিকশাওয়ালা বললেন,

'আপনি আমারে চিনতে পারছেন'? আমি 'না' বলায় জানালেন, গণেশতলা পাঠশালার সেই স্মৃতিমাখা দিনে যে ছেলেটি আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল এবং পরিণতিতে আমার ছুঁড়ে দেয়া কালির দোয়াতে আহত হয়েছিল, এই সেই ছেলে। কপালের ওপর সেই দাগটা দেখালো। আমি স্থবির হয়ে গেলাম। আজও এই স্মৃতি আমার মনকে দোলা দেয়।

পড়ালেখায় মনোনিবেশ

পড়ালেখার প্রথম অভিজ্ঞতাটা খুব সুখকর না হলেও এক বছর পর যখন দিনাজপুরের একাডেমী হাইস্কুলে ভর্তি হলাম, তখন আর ফিরে আসতে হয়নি কোনোদিন স্কুল থেকে মারামারি বা দুষ্টুমি করে। সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত এই স্কুলে এবং অষ্টম শ্রেণী থেকে মেট্রিক পর্যন্ত মহারাজা গিরিজানাথ স্কুলে পড়েছি। ইন্টারমিডিয়েট করেছি কোলকাতার রিপন কলেজেরই একটি শাখা সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে।

বাবার হাতের বেতের বাড়ি

মাছ ধরার খুব শখ ছিল আমার। সবাই মিলে অর্থাৎ জ্ঞাতি ভাইবোনদের সঙ্গে খেলাধুলা করতাম সারিয়াকান্দিতে গেলে। মার্বেল, ডাংগুলি খেলতাম। ঘুরি ওড়াতাম আর গ্রাম দেখে বেড়াতাম। আর এরই ফাঁকে ফাঁকে মাছ ধরতে যেতাম। এই মাছ ধরার জন্য একবার বাবা আমাকে প্রচন্ড মেরেছিলেন বেত দিয়ে। ওই প্রথম এবং শেষ বাবার হাতে মার খাওয়া।

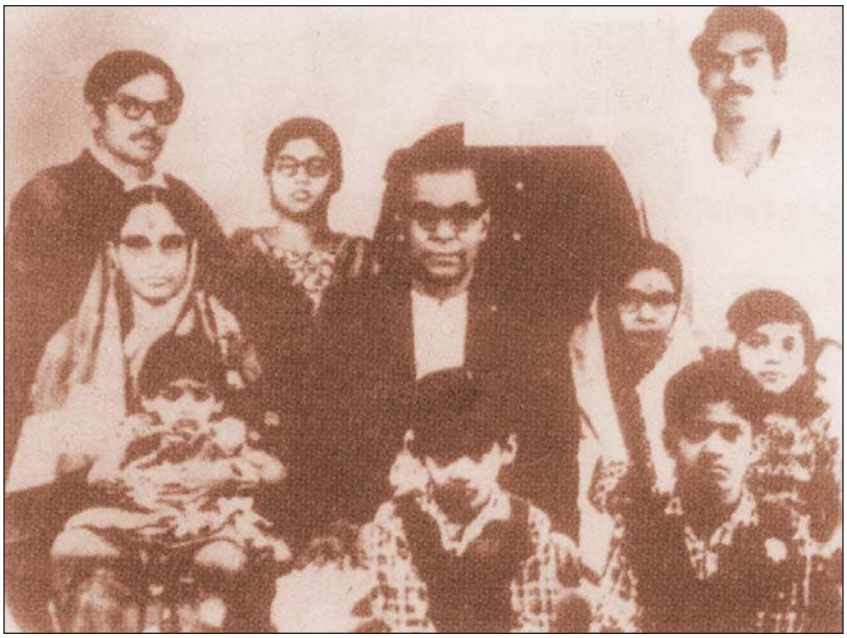

gv-evevi m‡½ ew`‡K `wo‡q mfvI `Ë, cv‡k †QvU †evb Sbv `Ë, fvB weKvk `Ë, ¯^x mxgv `Ë Ges †Q‡j‡g‡q evjwR, ivbwR, wkíx I kZvãx

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ডাকাতি

১৯৩৮-৩৯ সালের কথা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। তখন মাঝে মাঝে ডাকাতি হতো। একে তো জাপানি বোমার ভয়, তার ওপর ডাকাতির ভয়। এর সঙ্গে আবার যোগ হয়েছিল নদীভাঙনের আতঙ্ক। আমাদের বাড়িতে যেন ডাকাত না পড়ে সেজন্য সব রকমের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমার বড় কাকার বন্দুক ছিল। আশপাশের লোকজন এসে বাড়ি পাহারা দিত। সব সময় একটা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, ছোট ছিলাম বলেই হয়তো এখনো গেঁথে আছে মনে।

বসুন্ধরা ছবির জন্য মডেল হিসেবে ববিতা

নাটক পাগল পরিবার

আমার বাবা খুব ভালো অভিনয় করতেন। তাঁর অভিনয় আমি দেখেছি। 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে তিনি নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। কাকারাও অভিনয় করতেন। মামাবাড়িতেও মেজ মামা ছিলেন নাটক পাগল মানুষ। তিনি নাটক লিখতেন এবং অভিনয় করতেন। আমিও তখন ছোটখাটো চরিত্রে অভিনয় করেছি।

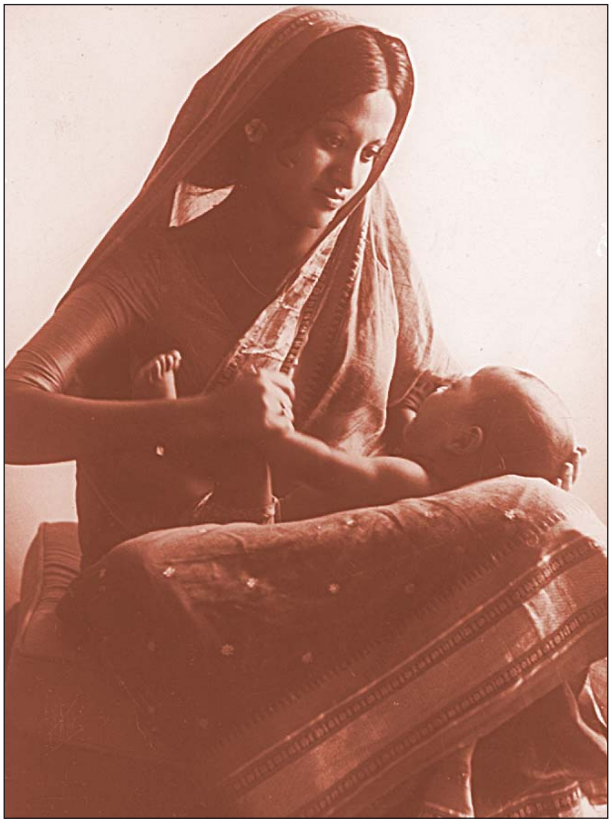

পরিচালনায় আমি

আমি তখন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। মেজ মামার লেখা 'পরাজয়' নামের একটি নাটক আমি পরিচালনা করেছিলাম। নিজেও ছোট ছিলাম, অভিনয়ও করিয়েছি সব বাচ্চাদের দিয়ে। পরিচালক সুভাষ দত্তের হাতে খড়িটা বোধকরি সেই দিনই হয়েছিল। আর বাবা-কাকা ও মামাদের সঙ্গে ছোটবেলায় রামের সুমতির রাম, বিন্দুর ছেলের নরেন, সিরাজদ্দৌলার মেয়ে জোহরা ইত্যাদি চারিত্রে অভিনয় করে করে আমার ভেতরে কোনো জড়তা ছিল না। অভিনয়ের ভিতটাও এই সময়ই পাকাপোক্ত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে শুধু ঝালাই করে গেছি। আত্মস্থ করেছি অভিনয়ের নানা কলাকৌশল।

পটুয়া হওয়ার স্বপ্ন

লেখাপড়ায় বরাবরই ভালো ছিলাম। দুষ্টুমিতেও প্রথম শ্রেণীর। আর ছবি আঁকায় একেবারে সেরা। খেলাধুলায়ও ছিলাম ভালো। কিন্তু ছবি আঁকায় আমি টেক্কা দিতাম সবাইকে। কলেজে সায়েন্স নিয়ে পড়েছি। বাসা থেকে সবাই ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখছে আমাকে নিয়ে। আমি তখন কঠিনভাবে বেঁকে বসলাম। আমি ডাক্তার হব না, চিত্রশিল্পী হব। বাসায় প্রচন্ড বাগ্‌বিতন্ডা হয় এ নিয়ে। কারণ কলকাতা ছাড়া তখন চারুকলার কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না। তাতে অনেক খরচ। এতো খরচ পরিবার থেকে দেয়া সম্ভব নয়। আমার স্বপ্ন তাতে থেমে থাকেনি। আমি যখন মহারাজা গিরিজানাথ হাইস্কুলের ছাত্র, তখন একবার স্কুল পরিদর্শনে এসেছিলেন ড. মেঘনাথ সাহা। আমি সেবার কাগজ কেটে একটি ঘর তৈরি করেছিলাম। তিনি সেটা দেখে খুব প্রশংসা

করে আমাকে একটা সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। আমি তাতে উৎসাহিত হই। এই ঘটনাগুলো আমার জীবনের পাথেয় হিসেবে কাজ করেছে। ছবি আঁকার কাজটি আমার নিত্যনৈমিত্তিক কাজের মতোই ছিল। কলেজে পড়ার সময়ই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা বেশি করবো না। কিন্তু পটুয়া হব আমি এ ব্যাপারে বদ্ধপরিকর।

সিনেমা পাবলিসিটি

বড় মামা চাকরি করতেন ডিবি সিনেমায়। সেটা একটা বড় সুযোগ ছিল। এছাড়াও আমি প্রচুর সিনেমা দেখতাম। সিনেমা দেখার পোকা যাকে বলে আরকি। কলেজে পড়ার সময়ই আমি দিনাজপুরের লিলি টকিজে অনেক কাজ করেছি। সিনেমা পাবলিসিটির প্রতি তখন প্রচন্ড আকর্ষণ অনুভব করলাম। ঠিক করলাম সিনেমা পাবলিসিটির ওপরই প্রশিক্ষণ নেব। তখন আমার বয়স ২০-২১ হবে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলাম আনুষঙ্গিক অনেক কিছু না ভেবেই।

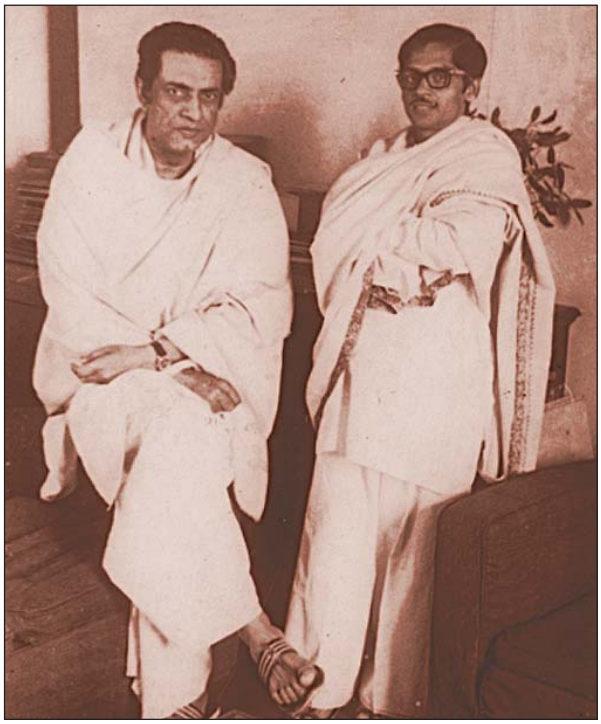

wekL¨vZ Pj¨vPÎ e¨w³Z mZ¨wRr iv‡qi m‡½ mfvl `Ë

বম্বে পাড়ি

যেমন ভাবা, তেমনই কাজ। কিছু টাকা-পয়সা নিয়ে চলে গেলাম বম্বে। এটা ১৯৫১ সালের কথা। আইএসসি পরীক্ষা দিয়ে ফেলেছি। তো বম্বে গিয়ে থাকবো কোথায়, খাব কী, করবো কী এগুলো কিছুই ঠিক করে আসিনি। অবশ্য এ নিয়ে আমার কোনো অস্থিরতাও ছিল না। রেলস্টেশনের কাছে একটি হোটেলে উঠলাম। কিন্তু কিছুদিন পরই টাকা-পয়সা শেষ। বুঝলাম এখানে আর আমার থাকা সম্ভব নয়। যদিও আমি ফিরে আসার মানসিকতা নিয়ে বম্বে যাইনি, তবুও পরিস্থিতি আমাকে ফিরে আসার চিন্তা করতে বাধ্য করছিল। যেই দিন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলাম যে চলে আসবো, ঠিক সেই দিনই বিশ্বনাথ নামে এক বন্ধুর সঙ্গে আমার দেখা। ও সেখানকার আর্ট কলেজে পড়ে। আমার সব কথা শুনে এবং ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত জেনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। সান্তা ক্রুজের একটি মেসে নিয়ে সেখানকার প্রধান সুনীল সেনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। তিনি বিখ্যাত চিত্রশিল্পী জয়নুল আবেদিনের সহপাঠী ছিলেন। এক শর্তে আমাকে থাকার অনুমতি দিলেন। শর্তটি হচ্ছে সেখানকার সবাইকে রান্না-বান্না করে খাওয়াতে হবে। আমি রান্নার কিছুই জানতাম না। তারপরও রাজি হলাম, কারণ 'স্ট্রাগল ফর এক্সিসটেন্স', তারপর স্ট্রাগল ফর সুপরিমেসি এ কথাটা আমি জানতাম এবং মানতাম।

চাকরি হলো

৩০ টাকা বেতনের একটি চাকরি তারা আমার জন্য ঠিক করে দিল। একেবারেই বেয়ারার চাকরি। জমিদার বংশের ছেলে হয়েও কিছু মনে করিনি। কারণ আমার লক্ষ্য ছিল সিনেমা পাবলিসিটি শেখা। নিবিষ্ট মনে চেয়ে দেখতাম শিল্পীদের তুলি, ওয়াটার কালার, স্প্রে পেইনটং, পেন্সিল চারকোল। কিভাবে পোস্টারিং করে, শো কার্ড করে; ব্যানার, বুকলেট পাবলিসিটি করে। অল্প কিছুদিন পরই এক বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে সহকারী হিসেবে কাজ শুরু করলাম ৬০ টাকা বেতনে।

শুরু হলো ভাষা আন্দোলন

ঢাকায় তখন তুলকালাম কান্ড চলছে। বম্বে বসেই খবর পেলাম। বাংলা ভাষার জন্য জীবন দিয়েছেন বরকত, সালাম, রফিক, জব্বররা। ওখানকার পত্র-পত্রিকায় বড় বড় হেডিংয়ে খবর থাকতো। ১৯৫২ সালের শেষের দিকে পাসপোর্ট-ভিসা শুরু হয়ে যাবে। যে যেখানে আছে, সে সেখানকার নাগরিক হিসেবে গণ্য হবে। বাবার চিঠি পেলাম ফিরে যাবার। পাসপোর্ট-ভিসা করে আবার ফিরে আসবো এই প্রত্যাশা নিয়ে ফিরে এলাম দিনাজপুর।

পাসপোর্ট-ভিসার জন্য দিনাজপুর ফিরে এসে সমস্ত কাজ শেষ করে যখন বম্বে ফিরে যাবার উদ্যোগ নিচ্ছি- বাবা বললেন, ছোটবোনের বিয়ের কথা চলছে। বড় ছেলে হিসেবে দায়িত্ব আছে। টাকা-পয়সার ব্যাপারও আছে। সুতরাং যাওয়া হলো না। লিলি টকিজে ব্যানার পাবলিসিটি শুরু করলাম নতুনভাবে।

ঢাকার হাতছানি

ফনিভূষণ গুহ নামের এক ভদ্রলোক একবার দিনাজপুর এলেন। ঢাকার 'মানস আর্ট' নামের একটি চিত্র প্রতিষ্ঠানের রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিলেন তিনি। এখানে আমার কাজ দেখে বললেন দিনাজপুরে পড়ে না থেকে ঢাকায় চলে আসতে। আমার খুব একটা আগ্রহ ছিল না ঢাকা যাওয়ার। কিন্তু ফনিবাবু ঢাকায় গিয়েই তাঁতীবাজারের কাছে ঝুলনবাড়ি নামের একটি জায়গায় 'এভারগ্রিন পাবসিলিটি'তে ১১০ টাকা বেতনের চাকরি চূড়ান্ত করে আমাকে সংবাদ দিলেন। এটা ১৯৫৩ সালের কথা। চাকিরটা করবো কি করবো না এই দোটানায় থেকে একসময় সিদ্ধান্ত নিয়ে ঢাকায় চলে এলাম।

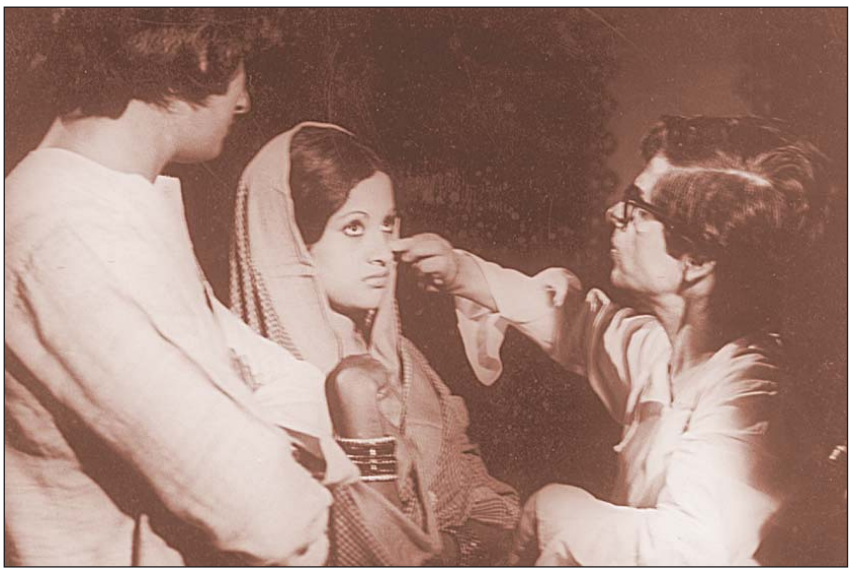

GKwU Qwei `‡k¨ ewZvi †gKAvc wVK K‡i w`‡"Qb mfvl `Ë

†iKwWs ÷wWI‡Z Ab¨vb¨‡`i m‡½ mfvI `Ë

প্রথম প্রেম

বম্বে থাকার সময় আমারই সমবয়সী একটি মেয়ে আমাকে কাজে সাহায্য করতে চাইতো। সম্ভবত খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল আমার প্রতি। আমার তখনকার সংগ্রামী জীবনে ভালোবাসার বা কারো ভালোবাসা অনুভব করার অবকাশ ছিল না। তবে দিনাজপুরে ফিরে আসার পর একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম আমি। বম্বের সেই মেয়েটির স্মৃতি হয়তো অবচেতন মনে আমাকে আলোড়িত করতো, তারই রিঅ্যাকশন এই প্রেম। আমার বহু ছবিতে এই প্রেমের ছোটখাটো ঘটনা স্থান পেয়েছে। আমি কোনোদিন সে মেয়েকে স্পর্শ করিনি। আমাদের প্রেম ছিল দূর থেকে। আমি ছোট বোনের মাধ্যমে লেবুর রসে চিঠি লিখে পাঠাতাম, যা কিনা শুধু জলে ভেজালেই পড়া সম্ভব। এমনিতে শুধু একটি সাদা কাগজ মনে হবে। সে কখনো আমাকে চিঠি লেখেনি। চিঠিতে খুবই সাধারণ কথা থাকতো। কেমন আছো, দেখা হয় না, কবে দেখা হবে, সিনেমায় যাবে কি না ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত প্রেমটা পরিণতি পায়নি। কারণ দু'পক্ষেরই অমত ছিল। তখন পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের পছন্দকে মূল্য দেয়া সম্ভব ছিল না। পারিবারিক সম্মান, নিজের অবস্থান সবকিছু বিবেচনায় রাখতে হতো। ব্যর্থ প্রেমের বেদনা ভোলার জন্য ঢাকায় চলে এলাম ১৯৫৩ সালের ২৩ নবেম্বর। প্রথম প্রেম কি ইচ্ছে করলেই ভোলা যায়!

Aemi gn‡Z mfvI `Ë

ঢাকায় প্রথম কাজ এবং বিয়ে

'এভারগ্রিন পাবলিসিটি'তে ১১০ টাকা বেতনে কাজ শুরু করলাম। অল্প দিনেই খুব নাম-ডাক হয়ে গেল। চারুকলার ছেলেরা এসেও আমার কাজ দেখে যেত তখন। আমি খুব দ্রুত কাজ করতে পারতাম। কোম্পানি খুশি হয়ে পরের মাসেই আমার বেতন বাড়িয়ে ১৫০ টাকা করেছিল।

বেতন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবার থেকে বিয়ের জন্য চাপ দেয়া হলো। প্রথম প্রেমের ব্যর্থতার একটি মনবেদনা তো ছিলই। বিয়ের জন্য সম্মতি দিলাম। কিন্তু দুটি শর্তে। প্রথমত, কোনো যৌতুক নেয়া যাবে না। দ্বিতীয়ত, পাত্রী আমার থেকে যেন লম্বা না হয়। বাবার এক বন্ধুর মেয়ের সঙ্গেই আমার বিয়ে ঠিক হলো। বিয়ের আগে আমরা কেউ কাউকে দেখিনি। বিয়ের আসরেই প্রথম দেখি। ১৯৫৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি আমার বিয়ে হয়। ঢাকার পানিটোলা নামের একটি জায়গায় বাসা ভাড়া করে সংসার শুরু করি আমি।

অনভিপ্রেত ঘটনা

আমার করা একটি পোস্টারের ওপর অন্য একজনের রঙ ও তুলি লাগানোকে কেন্দ্র করে অনভিপ্রেত একটি ঘটনা ঘটে গেল। আমাকে না জিজ্ঞেস করে আমার ছবিতে কেউ হাত দেবে, এটা আমি সহ্য করতে পারিনি। ভীষণ সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে চাকরি ছেড়ে দিলাম। স্ত্রীকে খবরটা দিতেই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, ভাগ্য আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। সুতরাং ভাবনার কিছু নেই। 'এভারগ্রিন পাবলিসিটি'র মালিক আমার বাসায় এলেন। রেস্তোরাঁয় খাওয়ালেন। অনেক অনুরোধ করলেন। আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য তার পক্ষে যতোটা সম্ভব তিনি করলেন। কান্নাকাটি করলেন, হাত ধরলেন। বললেন, আপনার জন্যই আমার ফার্মে কাজ আসে। বেতন ১৫০ থেকে ৩০০ পর্যন্ত করতে চাইলেন। কিন্তু আমার মন কিছুতেই নরম হলো না। সিদ্ধান্তে অটল থাকলাম। কিছুদিন পত্রিকায় কার্টুন এঁকে এবং পরে কাশেম ও আকরাম নামের দু'জন শিল্পীকে নিয়ে 'কামার্ট পাবলিসিটি' নামে একটি ফার্ম দিলাম। তাদের পুঁজি আমার শ্রম। স্বাভাবিক কারণেই আমার আগের ক্লায়েন্টরা আমার কাছেই কাজ নিয়ে আসতে শুরু করলেন। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ফিতা কেটে আমার এই ফার্ম উদ্বোধন করেন।

প্রথম ছবির পাবলিসিটি করি

'মুখ ও মুখোশ' নামের ছবিটির কাজ '৫৫-৫৬-এর দিকেই শুরু হয়। আমি খুবই গর্বিত যে, মুখ ও মুখোশ ছবির পাবলিসিটির কাজ আমার হাত দিয়েই হয়েছে।

পথের পাঁচালী

এর মধ্যে আমার সুযোগ ঘটে গেল সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' ছবিটি দেখার। ছবিটি দেখে আমার মাথা ঘুরে গেল। সেই সঙ্গে মেজাজ খারাপ। কারণ এমন ছবি তো আগে দেখিনি! আমি তো ছবিরই পাবলিসিটি করি। আমাকে যেটা সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত করলো সেটা হচ্ছে, সত্যজিৎ রায় নিজেও একজন কমার্শিয়াল আর্টিস্ট ছিলেন। আমিও তাই করি, সুতরাং তিনি যদি এই কাজ করতে পারেন, আমি কেন পারবো না! তখন আমি ব্রিটিশ কাউন্সিল, ইএসআইএস লাইব্রেরিগুলোতে যাওয়া শুরু করলাম। সেখানে সিনেমা টেকনোলোজির ওপর যে বইগুলো ছিল পড়া শুরু করলাম। পরিচালনা, পান্ডুলিপি, গান, ইত্যাদি বিষয়ের ওপর পড়ালেখা করলাম। প্রতিদিন যাওয়া সম্ভব হতো না বলে কিছু বই চুরি করেও নিয়ে এসেছি মাঝে মধ্যে। তারপর যখন নিজের ওপর আস্থা এলো, তখন প্র্যাকটিক্যাল দেখার প্রয়োজন অনুভব করলাম।

মাটির পাহাড় এবং এফডিসি

চিত্রালী পত্রিকার সম্পাদক এস এম পারভেজ 'মাটির পাহাড়' নামে একটি ছবি করবেন জানলাম। তাকে আমি জানালাম, আমি একটু ছবির লাইনে যেতে চাই। উনি হেসে বললেন, 'দূর! আপনি যে কাজ করছেন ড্রইং সেটাই করুন।' আমি নাছোড়বান্দা হওয়ায় তিনি

এফডিসিতে নিয়ে হাসান নামে কোলকাতা নিউ থিয়েটার্স থেকে আসা একজন শিল্প নির্দেশকের সঙ্গে পিচয়ে করিয়ে নিলেন। তার সঙ্গে আমি সহকারী হিসেবে কাজ শুরু করলাম। তার আগে তিনি কয়েকটি ছবি আঁকতে দিয়ে আমার পরীক্ষা নিলেন। আমি এই ছবিটির মাধ্যমে অনেক কিছু হাতে-কলমে শিখলাম। আমি তখন জানতে চাই কিভাবে ছবি শুট করে, লাইটিং কিভাবে করে এ বিষয়গুলো। এরপর ফতেহ লোহানী সাহেবের 'আকাশ মাটি' ছবির পাবলিসিটিও আমি করেছি।

এর মধ্যেই ক্যাপ্টেন এহতেশাম পত্রিকায় ঘোষণা দিলেন যে তিনি 'এদেশ তোমার আমার' নামে একটি ছবি করবেন। আমার অফিসের পাশেই তার অফিস ছিল। দেখা করে পাবলিসিটির কাজগুলো নিলাম। তারপর ছবির শুটিং দেখার ইচ্ছা ব্যক্ত করলাম। তিনি বললেন, 'আমার প্রথম ছবি। এই শুটিং দেখার কী আছে? আমারই ভয় করছে।' তারপর আমাকে একটু ভালো করে দেখে বললেন, 'অভিনয় করবেন?' অভিনয়ের কোনো চিন্তাই তখন মাথায় নেই। তবুও জানতে চাইলাম আমাকে দিয়ে অভিনয় হবে? কারণ আমার এফডিসিতে ঢোকা দরকার। শুটিং দেখা দরকার, আমি তো পরিচালক হতে চাই। তিনি বললেন, 'আমি করিয়ে নেব।' রাজি হয়ে গেলাম। এক টাকা পারিশ্রমিকে একটি কনট্রাক্ট ফর্মে সই করলাম। একটি চাঁদির টাকা আমাকে দিয়ে প্রোডাকশন ম্যানেজার সেটা আবার নিয়েও নিলেন। বললেন, এক টাকা নিয়ে আপনি কী করবেন?

প্রথম শুটিং

এফডিসির ১ নম্বর ফ্লোর। আমার চরিত্রটি ছিল একজন দুষ্টু নায়েবের। আমার সহশিল্পী ছিলেন খান আতা, সুমিতা দেবী, রহমান। জহির রায়হান ছিলেন এহতেশাম সাহেবের প্রধান সহকারী। তিনি আমাকে সংলাপ বুঝিয়ে দিলেন। ক্যামেরায় ছিলেন কিউ এম জামান। আমার চরিত্রটির নাম ছিল কানুলাল। চার লাইনের সংলাপ। এক শটে ওকে হয়ে গেল। জামান সাহেব বললেন, আমার ক্যামেরার সামনে আজ পর্যন্ত কেউ এক টেকে ওকে করতে পারেনি। আপনি পেরেছেন, সুতরাং মিষ্টি খাওয়ান। আমি বললাম আমি এক টাকার শিল্পী, তাও টাকাটা পাইনি। কেমন করে খাওয়াবো? তিনি বললেন, না খাওয়ালে পরের শট ওকে হবে না। তখন এর-ওর কাছ থেকে ধার করে বারো টাকা পেলাম। কারওয়ান বাজার থেকে মিষ্টি এনে সবাইকে খাওয়ালাম। ঐ ছবি মুক্তি পাওয়ার পর দেখা গেল আমি কৌতুক অভিনেতা হয়ে গেলাম। রাস্তায় বের হতে পারি না। মানুষ দেখলেই কানুলাল বলে ডাকে। এহতেশাম সাহেবেরই পরের ছবি 'রাজধানীর বুকে'তে আমি আবার অভিনয় করলাম। এবার সম্মানী ছিল পাঁচ শ' টাকা। তার পরের ছবিতে এক হাজার টাকা। এভাবে বাড়তে বাড়তে কুড়ি হাজার টাকা পর্যন্ত অভিনয়ের জন্য আমি সম্মানী নিয়েছি। উর্দু

mfvl `Ë cwiPwjZ c_g Qwe mZivs-G ZviB Awe®KZ bwqKv Keix

ছবিতেও কাজ করেছি। পশ্চিম পাকিস্তানে আমি তখন যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিলাম।

সুতরাং...

১৯৬১ সাল পর্যন্ত চুটিয়ে অভিনয় করে সিদ্ধান্ত নিলাম, আর অভিনয় নয়। এবার পরিচালনা। তৎকালীন জলসা নামের একটি পত্রিকায় 'একটি নিছক প্রেম' নামের একটি গল্প প্রকাশ হয়েছিল। এক বন্ধুর হাত দিয়ে সেটা আমার কাছে আসে। মোটামুটি একটা চিত্রনাট্য দাঁড় করাই। সৈয়দ শামসুল হককে দেখালাম। তিনি বললেন ভালো হয়েছে। ছবির নাম দিলাম 'সুতরাং'। কেন্দ্রীয় চরিত্রে আমি অভিনয় করবো। একটি ছোটখাটো মেয়েকে খুঁজছি, যিনি আমার বিপরীতে নায়িকা চরিত্রে কাজ করবেন। সত্য সাহাও তখন প্রথম আমার ছবিতেই সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে কাজ করার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। তিনিই মীনা পাল নামের একটি মেয়ের খবর দিলেন যে মঞ্চে নাচটাচ করে। এদিকে চিত্ত চৌধুরী ও আবুল খায়ের ছিলেন সুতরাং ছবির প্রযোজক। মেয়েটি চট্টগ্রাম থাকে। চলে গেলাম চট্টগ্রাম। গিয়ে শুনলাম, মীনা পাল মামাবাড়ি ময়মনসিংহ গেছে। ফিরে এলাম। পরে সত্য সাহাকেই বিভিন্ন পোজে ছবি তুলে নিয়ে আসতে বললাম মীনার। চট্টগ্রাম গিয়ে সে ছবি তুলে নিয়ে এলো। পছন্দ হলো আমার। এক সময় ঢাকায় এলো মীনা পাল। ১৪ বছরের ছোট্ট মেয়ে। কথায় আঞ্চলিকতার টান। শিখিয়ে-পড়িয়ে ১৯৬৩ সালের মে মাসে শুটিং শুরু হলো গুলশানে। এই ছবি তৈরির সময় অনেক প্রতিকূলতা আমাকে সহ্য করতে হয়েছে। আমি কৌতুক অভিনেতা, আমার পক্ষে ছবি পরিচালনা সম্ভব নয়। তারপর আবার নায়ক চরিত্র করছি। মানাবে নাকি! নায়িকা অখ্যাত, নতুন। ওকে দিয়ে কি ছবি চলবে! তারপর কাহিনী ছিল ট্র্যাজেডিনির্ভর। যা হোক আমার আত্মবিশ্বাস ছিল প্রচন্ড। এ ছবি মুক্তি নিয়েও প্রচুর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছি। অনেক ঝামেলার পর ১৯৬৪ সালের ২৩ এপ্রিল কোরবানি ঈদে গুলিস্তানে ছবিটি মুক্তি পেল। তখন জহির রায়হানের সঙ্গম ছবিটিও মুকুল হলে মুক্তি পেয়েছে। বম্বের ছবি, ইংরেজি ছবি, আমাদের দেশের ছবি, উর্দু ছবি মিলিয়ে 'সুতরাং' হলে ঢুকতেই পারছিল না। কোরবানি ঈদে তো অধিকাংশ মানুষ ঢাকা ছেড়ে চলে যায়। দুপুরের শোতে আসেই না। কিন্তু সেদিন হাউস ফুল। হলের মালিকই জানালেন, এতোদিনের হলে তার এই অভিজ্ঞতা হয়নি। দর্শক হয়তো আগে থেকেই আমার ভক্ত ছিল। সে কারণেই হলে ঢুকেছেন। এহতেশাম সাহেব আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি গুলিস্তান হলে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে ছবিটি দেখলেন। আমি কাঁপছি দেখে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, বললেন, কাঁপছো কেন? আমি বললাম, প্রথম ছবি তো তাই। তিনি বললেন, টাকা নিয়ে দেশে ফেরার পর যখন শুনবে নায়িকার বিয়ে হয়ে গেছে। তখন যদি দর্শক গ্রহণ করে তবেই ছবি চলবে। সেই দৃশ্য যখন পর্দায় দেখানো হলো, ভাবি জানালো নায়িকার বিয়ে হয়ে গেছে, হলভর্তি দর্শক 'ইশ্‌স্‌' শব্দ করে উঠলো। এহতেশাম সাহেব আমাকে চুমু খেয়ে বললেন 'দর্শক তোমার পক্ষে। তোমার ছবি হিট'। বলে তিনি জহির রায়হানের সঙ্গে ছবি দেখতে চলে গেলেন। 'সুতরাং' ছবিটি সাত সপ্তাহ চললো গুলিস্তানে।

'৭১-এর সেই দিন

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে আমাকে পাকিস্তানিরা ধরে নিয়ে গেল। অনেকের সঙ্গে আমাকেও কয়েক ঘণ্টা সেলের মধ্যে আটকে রেখে বের করে এনে লাইনে দাঁড় করালো। দু'জন মিলিটারি বন্দুক উঁচিয়ে ধরেছেন। সারাক্ষণই মনে হচ্ছে এই বুঝি ট্রিগার টিপলো।

GKwU we‡kl gn‡Z mfvl `Ë I bwqKv †iwRbv

অলৌকিকভাবে ক্যাপ্টেন প্রশ্ন করলো আমাকে। তোমার নাম কী?

আমি নাম বলায় চিনতে পেরে বললো, 'তুমি কি ফিল্মে কাজ করো?' আমি হ্যাঁ বলায় নিজেদের মাঝে আলাপ আলোচনা করলো। পরে বললো- look Mr. Suvash Datta, You are an artist. You are not only an artist, you are a good artist. So হাম তুমকে ছোড় দিয়া।' এই অংশটি পরে আমি অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী ছবিতে ব্যবহার করেছিলাম।

ছবির সংখ্যা বাড়লো

সুতরাং ছবির সাফল্যের পর 'কাগজের নৌকা' নামে একটি ছবি করলাম। এতে নায়িকা সুচন্দা নায়ক আখতার হোসেন। তারপর 'আয়না ও অবশিষ্ট,' 'আবির্ভাব' ছবি দু'টি করি। আবির্ভাব ছবির পর 'পালা বদল' ছবি দিয়ে আবার অভিনয়ে চলে আসি। আমার বিপরীতে তখন পল্লবী নামে একটি মেয়ে অভিনয় করে। তারপর করলাম 'আলিঙ্গন'। এ ছবিতেও মন্দিরা নামের একটি নতুন মেয়েকে সুযোগ দিই আমার বিপরীতে। এরপর উজ্জলকে নায়ক করে আর কবরীকে নায়িকা করে 'বিনিময়' ছবিটি করি। বিনিময় শেষ হওয়ার পর কবরীর প্রযোজনায় 'বলাকা মন' নামের একটি ছবির কাজ করি। দিলারা হাশেমের 'ঘর-মন-জানালার গল্প অবলম্বনে ছবির কাহিনী গড়ে উঠেছিল। ১৯৭১-এর মার্চ পর্যন্ত ছবির শুটিং হয়। ২৫ মার্চ তো যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ১৯৭১-এ মিলিটারির হাত থেকে ছাড়া পেয়ে নানা ঝড়ঝঞ্ঝা পোহানোর পর কোলকাতা পৌঁছালাম। যুক্ত হলাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে। সেখানে নাটক, একাঙ্কিকায় অংশ নিলাম। মঞ্চেও নাটক করেছি। মৃণাল সেনের 'কোলকাতা '৭১ নামের একটি ছবিতে কাজ করার সুযোগ পেলাম। সুখেন দাসের একটি ছবিতেও কাজ করলাম। এভাবেই কেটে গেল মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো।

আবার ছবি

১৯৭২ সালে 'অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী' ছবিটি তৈরি করলাম। তারপর বলাকা মন ছবিটি শেষ করলাম। রাজ্জাকের 'আকাঙ্ক্ষা' ছবির পরিচালনা করলাম। ১৯৭৫-এ এসে সিদ্ধান্ত নিলাম আর অভিনয় নয়। ১৯৭৭-এ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের ছবি করলাম 'বসুন্ধরা'। বাংলাদেশের প্রথম রঙিন ছবি। তারপর করলাম 'ডুমুরের ফুল'। আশির দশকে এসে প্রচুর কমার্শিয়াল ছবি করেছি।

অপরাধবোধ

যে বোনটার বিয়ে দিয়েছিলাম আমি, সে থাকতো শিলিগুড়িতে। ১৯৭৫ সালে স্বামী-সন্তান নিয়ে বেড়াতে এলো। 'আকাঙ্ক্ষা' ছবির শুটিং হচ্ছে তখন চন্দ্রা ফরেস্টে। ভগ্নিপতিকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম শুটিং দেখতে। গাড়ি দুর্ঘটনায় সেদিন আমার ভগ্নিপতি মারা যান। আমার পাশেই তিনি বসেছিলেন। আমি শুধু পায়ে আঘাত পেয়েছিলাম। কিন্তু ভগ্নিপতিকে বাঁচাতে পারিনি। সেই কষ্ট আজও বয়ে বেড়াই।

মানসিক পরিবর্তন

আমি যখন বম্বে গিয়েছিলাম, তখন কোনো উপায় না করতে পেরে ফিরে আসার দিনই বন্ধু বিশ্বনাথের সঙ্গে দেখা হয়। সে আমাকে থাকা-খাওয়া এবং একটি কাজেরও ব্যবস্থা করে দেয়। সেই দিনই আমার মধ্যে ঈশ্বরে বিশ্বাস জন্মেছিল। এরপর ভগ্নিপতিকে হারানোর ফলে সেই ভাব পাকাপোক্ত তো হলোই, যোগ হলো মৃত্যুচিন্তা। মানুষের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যু

¯x mxgv `Ë I †Q‡j‡g‡q evjwR, ivbwR, wkíx I kZvãxi mv‡_ mfvI `Ë

অবধারিত- এই সত্যটা নতুনভাবে উপলব্ধি করলাম। প্রচুর বই পড়তে শুরু করলাম। কোরআন পড়েছি দু'বার। এছাড়া বেদ, গীতা, বাইবেল, ত্রিপিটক তো আছেই। সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করেছি। আমি ১৯৭৫ সালের ৭ জানুয়ারি রামকৃষ্ণ মিশনের দশম প্রেসিডেন্ট শ্রীমৎ স্বামী বিরেশ্বরানন্দ মহারাজজীর কাছে ইষ্টমন্ত্রে, ঠাকুরের মন্ত্রে দীক্ষিত হই। তারপর থেকে নিয়মিত জপ-ধ্যান করি।

চিরসবুজের রহস্য

৭৫ বছর বয়সেও সুস্থ দেহে থাকা এবং তারুণ্য বজায় রাখার রহস্য অনেকেই জানতে চান। আমি ছোট থেকেই নিয়মতান্ত্রিকভাবে চলেছি। খুব ভোরে ওঠা অভ্যাস। উঠে কিছু ব্যায়াম করি। তারপর টয়লেট থেকে এসে একটু গাজরও পেঁপেজাতীয় কিছু খাই। নিমপাতা আর গোলমরিচ আমার নিত্যসঙ্গী। চারটা নিমপাতা হলে দুটো গোলমরিচ চিবিয়ে খেয়ে ফেলি। এটা আমার সারা দিনের শক্তি দেয়। তারপর মেডিটেশনে বসি। এতে সারা দিনের কাজগুলো কম্পিউটারের মতো আমার ব্রেনে সারিবদ্ধ হয়ে যায়। তারপর বাসায় এসে খাবার খাই। আমি নিরামিষভোজী। লবণ এবং মসলা ছাড়া খাই। সকাল সাড়ে নটা-দশটার মধ্যে খাই। সারা দিন আর কিছু না। বিকেলে ওভালটিন, রাতে আবার একটু নিরামিষ-ভাত। এই আমার খাদ্যাভ্যাস। কোনো নেশা নাই। নিয়ম মতো চলা, শরীরকে ভালোবাসা সুস্থতার প্রথম শর্ত।

মৌনব্রত পালন

শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের অনুসারী স্বামী বিবেকানন্দের একটি আর্টিকেল পড়ে আমি জানলাম মৌনব্রত পালন করলে আত্মজ্ঞান বাড়ে, কথার জোর বাড়ে। এটা আমাকে সাংঘাতিকভাবে আকর্ষণ করলো। বাসার সবাইকে জানালাম আগামী 'সাতদিন আমি কারো সঙ্গে কথা বলবো না। সবাই তুমুল আন্দোলন করলো। কিন্তু আমি তাই করলাম। এতোটা সময় কথা না বলায় আট দিনের দিন দেখা গেল আমার ভোকাল কড কাজ করছে না। ধীরে ধীরে যখন ব্রেইনের মাধ্যমে স্বর বের হতে শুরু করলো, আমি অনুভব করলাম যে আমার মধ্যে একটি রোমাঞ্চকর অনুভূতি কাজ করছে। কিন্তু সাতদিন কথা না বলে থাকলে আমার কাজের ক্ষতি হবে। এটাকে কমিয়ে প্রথম তিন দিন এবং এখন রাত বারোটা থেকে সকাল দশটা পর্যন্ত মৌনব্রত পালন করি। এটা ১৯৯১ সালের কথা। প্রতিজ্ঞা করেছি আমৃত্যু এই নিয়ম পালন করে যাবো।

আমার পরিবার

দুই ভাই, তিন বোনের মধ্যে আমি সবার বড়। স্ত্রী সীমা দত্ত ২০০১ সালে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন। দুই ছেলে শিবাজী ও রানাজী। দুই মেয়ে শিল্পী ও শতাব্দী। ছোট ছেলে সুইডেন প্রবাসী। বাকি তিনজন দেশে।

বিভিন্ন পুরস্কার

১৯৬২ সালে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে শ্রেষ্ঠ

কৌতুক অভিনেতা হিসেবে নিগার অ্যাওয়ার্ড পেলাম 'চান্দা' ছবির জন্য। ১৯৬৫ সালে ফ্রাঙ্কফুর্ট চলচ্চিত্র উৎসবে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে 'সুতরাং' পুরস্কার পায়। ১৯৬৫-তে 'তালাশ' ও 'মিলন' ছবির জন্য পাকিস্তান চলচ্চিত্র পুরস্কার পাই সহ-অভিনেতা হিসেবে। ১৯৬৭ সালে মস্কো চলচ্চিত্র পুরস্কার পাই 'আয়না ও অবশিষ্ট' ছবির জন্য। ১৯৬৯ সালে কম্বোডিয়া নমপেন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে কম্বোডিয়ার রানীর পক্ষ থেকে বিশেষ পুরস্কার পাই 'আবির্ভাব' ছবির জন্য। ১৯৭৩ সালে 'অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী' ছবিটি মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে সার্টিফিকেট অব ম্যারিট পায়। ১৯৭৭ সালে 'বসুন্ধরা' পায় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে। শ্রেষ্ঠ প্রযোজক ও পরিচালক হিসাবে ১৯৭৮ সালে বাচসাস পুরস্কার পায় 'ডুমুরের ফুল' ছবিটি। এই ছবিটি ১৯৭৯ সালে মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে শিশু চলচ্চিত্র বিভাগে বিশেষ পুরস্কার পায়। প্রযোজক সমিতির পুরস্কার পায় শ্রেষ্ঠ কস্টিউম ডিজাইনার হিসেবে 'আবদার' ছবিটি ১৯৯৯ সালে। ২১শে পদক ১৯৯৯ সালে। এছাড়াও সাংস্কৃতিক জোটের বঙ্গবন্ধু পুরস্কার, জহির রায়হান পুরস্কার, আব্দুল জব্বার খান স্মৃতি পুরস্কার, আই কি ই '৯৫, এস এস পারভেজ পুরস্কার, মেরিল-প্রথম আলো আজীবন সম্মাননা পুরস্কার ২০০৩, গীতাঞ্জলী পুরস্কার ২০০৪, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব কর্তৃক পুরস্কার ২০০৪। তবে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পুরস্কার হচ্ছে ১৯৬৫ সালে। 'সুতরাং' পুরস্কৃত হওয়ার পর সত্যজিৎ রায় তার একটা ছবির পেছনে অভিনন্দন বার্তা লিখে আমাকে পাঠান। আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার এটি। কারণ তাঁর ছবি দেখে অনুপ্রাণিত হয়েই আজ আমি এ জায়গায়।

dv¼dU ci¯'vi cvIqvi ci mZ¨wRr iv‡qi cvVv‡bv ïf"Qv

weweb mgt‡q cvIqv ci¯'v‡i cvIqv Ask we‡kl

চলচ্চিত্রে আসতে চায়নি

আমার অন্য ভাই-বোন, পরবর্তীতে চার ছেলেমেয়ের কেউ চলচ্চিত্রে কাজ করতে চায়নি। এটা ওদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার ব্যাপার। আমিও জোর করিনি। আমার পেছনে কেউ ছিল না এগিয়ে দেয়ার। কিন্তু ওদের পেছনে আমি ছিলাম। কেউ ইচ্ছা করেনি এখানে কাজ করতে। আমি চেয়েছিলাম ছেলেরা কেউ অভিনয় না হোক, টেকনিকাল দিকটাতে আসুক। এ নিয়ে কোনো দুঃখবোধও নেই আমার।

এখন পর্যন্ত শেষ ছবি

হুমায়ুন আহমেদের একটি গল্প নিয়ে ১৯৯২ সালে 'আবদার' নামে একটি ছবি করেছিলাম শেষ। তারপর যখন দেখলাম চলচ্চিত্রের চরিত্রটাই নষ্ট হয়ে গেছে, তখন সরে এলাম ওই অঙ্গন থেকে।

আমার ছবি

সুতরাং, কাগজের নৌকা, আয়না ও অবশিষ্ট, আবির্ভাব, পালাবদল, আলিঙ্গন, বিনিময়, আকাঙ্ক্ষ- এ ছবিগুলোতে অভিনয়ও করেছি।

রাজধানীর বুকে, সূর্যস্নান, চান্দা, তালাশ, হারানো দিন, নতুন সুর, রূপবান, মিলন, নদী ও নারী, ভাইয়া, চলো মান গ্যায়ে, ফির মিলেঙ্গে হাম দোনা, ক্যায়াস কহু, আখেরি স্টেশন, সাগর, পয়সা, সোনার কাজল, দুই দিগন্ত, সমাধান, কলকাতা '৭১, নয়া মিছিল, আয়না (মুক্তি পায়নি)।

চলচ্চিত্র থেকে খানিকটা সরে এসে আমি প্যাকেজ নাটক করা শুরু করলাম। এ পর্যন্ত প্রায় আঠারো টার মতো নাটক করেছি। এর মধ্যে আমি ভালো আছি, হৃদয়ের কাছে, আংটি, গন্ডি, একটি মুক্তা, যেদিন জীবনে, লাল গোলাপ, মরুব্বী এবং ভালোবাসা, আর কোনোদিন, শেষ কথা (ধারাবাহিক), লক্ষ্মী সবদারণী উল্লেখযোগ্য।

আবার চলচ্চিত্র

এ বয়সে আবার চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রস্তাব আসছে। আমি ছবি করতে চাই। তবে তার বিষয়বস্তু নির্মাণে আমার নিজস্ব স্টাইল আছে। আমার কোনো ছবির বিষয়বস্তুর সঙ্গে কোনো ছবির মিল নেই। এখন টেস্টটিউব বেবির ওপর একটা ছবি নির্মাণ করার চিন্তা করছি। এর ওপর আমি প্রচুর পড়াশেখা করছি। রিসার্চ করছি, যেকোনো বিষয়ের গভীরে যাওয়া আমার স্বভাব। ফাঁকি-জুঁকির কাজ আমি করি না। প্রয়োজনে পতিতালয়ে, অন্ধ স্কুলে, বোবা স্কুলে, ডাক্তারের কাছে গেছি। বিষয়টি সম্পর্কে পুরোপুরি জেনে তবেই কাজে হাত দিয়েছি। সে জন্য আমার ছবির কোনো সমালোচনার সুযোগ থাকে না। টেস্টটিউব বেবি নিয়ে দেশে-বিদেশে কোনো ছবি এখনো হয় নাই। বিভিন্ন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছি। পেপার কাটিং সংগ্রহ করছি। আগামী অক্টোবর নাগাদ কাজটি শুরু করার আশা রাখি।

আমার আবিষ্কৃত অভিনয়শিল্পী

অনেককেই আমি প্রথম নিয়ে এসেছি চলচ্চিত্রে এরা কেউ কাজ করেছে, করছে। আবার কেউ একটা-দুটো কাজ করে ইন্ডাস্ট্রি ছেড়ে দিয়েছে। এদের মধ্যে কবরী, সুচন্দা, শর্মিলী, মন্দিরা, পল্লবী, ইলিয়াস কাঞ্চন, উজ্জ্বল, আহমেদ শরিফ, বেবী জামান, মাস্টার শাকিল উল্লেখযোগ্য।

আমার সতীর্থরা

জহির রায়হান, খান আতাউর রহমান এরা আমার সমসাময়িক। তারা সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন। জহির রায়হান পরিচালিত ছবিতে অভিনয়ও করেছি আমি। তাঁদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কে কোনো সমস্যা ছিল না। আমি সত্যজিৎ রায়ের ভক্ত ছিলাম বলে আমাকে তাঁরা দত্তজিৎ বলে ডাকতেন। তবে কাজের ক্ষেত্রে আমাদের একটা প্রতিযোগিতা ছিল অবশ্যই। কে কার চেয়ে ভালো ছবি বানাবো তার সুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতো। ব্যক্তিজীবনে কিন্তু তার ছায়া কখনোই পড়েনি।

বর্তমান চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে

আসলে এ নিয়ে কিছু কি বলার আছে? অর্থলগ্নী একটা বিরাট বিষয়। সুতরাং কিছু বলার বা করার নেই। তবে আমি আশাবাদী। বিশেষ করে

কিছু নির্মাতা এখন সুস্থ্য তৈরির উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসছে চলচ্চিত্র শিল্পে। তাছাড়া চ্যানেল আইর উদ্যোগটাও আমি শুভ উদ্যোগ মনে করি। দর্শক এখন হলে যায় না শুধু ভালো ছবি তৈরি হচ্ছে না বলেই নয় কিন্তু। হলের পরিবেশ দর্শকদের হলবিমুখ করছে। একটা বিষয়ের সঙ্গে অন্যটি জড়িত। সে ক্ষেত্রে ড্রয়িং রুমে বসে যদি দর্শকরা কিছু ভালো ছবি দেখতে পারে এবং উদ্যোক্তাও লাভবান হয় সেটা তো আমি অত্যন্ত পজেটিভ দিক বলে মনে করি। চলচ্চিত্রের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন চাইলে প্রথমত সংঘবদ্ধ হতে হবে। আর এগিয়ে আসতে হবে সরকারকে। দেশে একটা ইনস্টিটিউশন নেই। বেসরকারি উদ্যোগে স্ট্যামফোর্ড এবং ইউডা চলচ্চিত্রের ওপরে বিভাগ খুলেছে। এরা চেষ্টা করছে। আমি তাদের সাধুবাদ জানাই।

নায়িকাদের সঙ্গে সম্পর্ক

অভিনয় করেছি বা পরিচালনা করেছি, যখন যাই করি না কেন কাজের বাইরে কোনো সম্পর্ক রাখার কখনো প্রয়োজন মনে করিনি, এখনো করি না। সবার সঙ্গেই সম্পর্ক ভালো ছিল, এখনোও আছে। আমি যে নায়িকাদের নিয়ে এসেছি, তাদের কাজ করিয়েছি নিজের প্রয়োজনে। কিন্তু পরবর্তীতে তারা নিজের যোগ্যতায় জায়গা করে নিয়েছে।

একটি ক্ষোভ

এসএস প্রোডাকশন এবং ডিএফপির উদ্যোগে 'বেগম রোকেয়া' ছবির জন্য আজ প্রায় ১২/১৩ বছর ধরে একটা মানসিক যন্ত্রণায় আছি। ১৯৯২ সাল থেকে প্রসেসিং শুরু হয়েছে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উপস্থিতিতে ওসামানী মিলনায়তনে ছবিটির মহরতও অনুষ্ঠিত হয়। আগেই বলেছি যে কাজটি আমি করতে চাই, সে ব্যাপারে পুরোপুরি ধারণা নিয়ে রিসার্চ করে তবেই আমি কাজে হাত দেই। সে কারণেই বাংলা একাডেমী থেকে বেগম রোকেয়ার ওপর

mfvI `Ë I Zvi ¯x mxgv `Ë

যত বই আছে সব এনে আমি পড়েছি। তিনবার গেছি দিল্লিতে। ভাগলপুর, ঘাটশীলা, আলিগড় বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে নানা রকম তথ্য সংগ্রহ করেছি। বেগম রোকেয়ার স্কুল সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের পথম পাঁচজন ছাত্রের মধ্যে একজনকে পেয়েও ছিলাম ভাগলপুরে। তখন তাঁর বয়স ছিল পঁচানব্বই। আর মাত্র চার বছর বয়সে তিনি সেই স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন পর্দানসীন একজন মহিলা। আমি যখন যাই তাঁর নাতীর মাধ্যমে কাগজে হিন্দিতে লিখে লিখে কথাবার্তা বলেছি। তার কাছ থেকে বেগম রোকেয়ার কথা জেনেছি। বেগম রোকেয়ার স্বামীর আগের ঘরের মেয়ের কথা জেনেছি। দেখে এসেছি ভাগলপুরের বেগম রোকেয়ার বাড়িটিতে এখন সিনেমা হল নির্মাণ করা হয়েছে। প্রচুর হোমওয়ার্ক করেছি ছবিটা নিয়ে। বেগম খালেদা জিয়া নিজে এ ছবিটি তৈরির ব্যাপারে আগ্রহী। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমাদের কয়েক দফা সরকার বদল, তথ্য মন্ত্রণালয়ের কুয়াশাচ্ছন্ন ব্যবহার ছবিটি নির্মাণে দীর্ঘসূত্রতা ঘটাচ্ছে। এসএস প্রোডাকশনের কর্ণধার ওয়াহিদ সাদিক এবং শাবানা নিজে আমেরিকায় প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করে ছবিটির ব্যাপারে কথা বলেছেন। দেশে যখন তথ্যমন্ত্রী ছিলেন মঈন খান তখন কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে ছিল। যখন ভারতীয় অনুমতি আনার কথা শুটিং করার জন্য, ঠিক সেই সময় মন্ত্রণালয় বদল হলো। মন্ত্রণালয় আদৌ ছবিটি করার ব্যাপারে কতটুকু আগ্রহী সেটাই এখন ধোয়াটে। যে শিল্পীদের নিয়ে কাজ করার কথা ছিল তারাও বয়সে এগিয়েছে বারো-তেরো বছর। অনেকেই ছবিটি সম্পর্কে আমার কাছে জানতে চান। আমি উত্তর দিতে পারি না। কারণ আমি নিজেই জানি না। যথেষ্ট বিব্রতকর অবস্থায় আছি আমি। ছবিটির সঙ্গে আমার শ্রম, মেধা, আবেগ সব জড়িত। তারপরও অনিশ্চয়তা কাটছে না আদৌ ছবিটি হবে কি না। এটা ক্ষোভ নয় শুধু প্রচন্ড মনবেদনা।

কবরী পরিচালিত প্রথম ছবি আয়নাতে সুভাষ দত্ত

ভবিষ্যৎ নিয়ে

এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে যাচ্ছি আমেরিকা। কেএমপি আমাকে লাইভ টাইম এচিভমেন্ট দেবে। ফিরে এসে যদি বেগম রোকেয়ার কাজ করার অনুমতি পাই করবো। না হলে টেস্টটিউব বেবি নিয়ে যে ছবিটা করতে চাচ্ছি সেটা করবো। আপাতত আর কোনো পরিকল্পনা নেই।

আমার এক ভক্ত জ্যোতিষ আমার কোষ্ঠি করে দিয়েছেন। তাতে বলা হয়েছে আশি বছর বয়সে শুক্রবারে আমার জীবনাবসান হবে। যদি বেঁচে যাই তাহলে রোগশয্যায় শায়িত থাকবো। বর্তমানে আমার ৭৫ বছর বয়স। হিসেব অনুযায়ী আর পাঁচ বছর বাঁচার কথা। যে ক'দিন বাঁচি। সুস্থভাবে বাঁচতে চাই। সময়- সুযোগ পেলে আরো কিছু ভালো কাজ করে যেতে চাই। শক্তিপদ রাজগুরুর 'মেঘে ঢাকা তারা' নিয়ে একটি ধারাবাহিক নাটক করার কথা আছে। ভালো কাজের মধ্য দিয়েই বেঁচে থাকতে চাই সবার কাছে।

গ্রন্থনা : **শিল্পী মহলানবীশ**